১৮

স্বাধীন ভারতে নারী আন্দোলন এবং নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

[Feminist Movement and Political Participation of Indian Women in Post Independent India]

১৮.১ নারীবাদ কী ? What is Feminism ?

বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, **নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে** পরিণত করেছে ('Feminism is the force which has transformed women into self conscious social category.'—Bandana Chatterji, *Women & Politics in India*)।

বাসবী চক্রবর্তীর মতে, "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।" (বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা, পৃষ্ঠা ৩৮)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা **রাজশ্রী বসুর** মতে, নারীবাদ হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারণেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতী বসু আরও বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলে যাতে নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে। সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্যকে বোঝা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে অনুধাবন করা এবং কীভাবে এর সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা যায়—এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

এই নারীবাদ নারীকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাতে চায় যেখানে সে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিতে পারে। নারীবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলন, যা লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এককথায় বলা যায়, নারীবাদ হল এমন একটি প্রত্যয় যে নর অথবা নারী যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচার হবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ("In its essence it [feminism] is the belief that the nature and worth of a human being, man or woman, should be independent of gender.")।

১৮.২ নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা Different schools of Feminism

উনিশ শতকের সত্তরের দশকের থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারীবাদী আন্দোলনগুলি শুরু হয়েছে, দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সেগুলি ছিল একে অপরের থেকে আলাদা। ওইসব আন্দোলনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল :

Scanned with CamScanner

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ : উদারনৈতিক নারীবাদ বলতে সেই তত্ত্ব ও আন্দোলনকে বোঝায় যার ভিত্তি হল ধ্রুপদী উদারনৈতিক দর্শন। এটি হল নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের। আঠারো এবং উনিশ শতকের ইউরোপে যখন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হল তখন থেকেই এই নারীবাদের উদ্ভব। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করতেন। তাঁদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর ভোটাধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনি আধিকার।

The Vindication of the Rights of Women (1792) গ্রন্থের রচয়িতা **মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট** (Mary Wollstonecraft)-কে কেউ কেউ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁর সময়ে মহিলাদের না-ছিল সম্পত্তির অধিকার, না-ছিল ভোটাধিকার। তিনিই প্রথম নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন। তাঁর মতে, নারী যখন ব্যক্তি-পরিসরের (Private sphere) বাইরে গিয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং বাইরের কাজে যোগ দেবে, তখনই কেবল নারী সমাজে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠবে।

উদারনৈতিক নারীবাদের অপর একজন প্রবক্তা হলেন **জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি একজন পুরুষ হয়েও নারীদের অসম সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং পুরুষের সমান পূর্ণ আইনি তথা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। মিল-এর লেখা** *The Subjection of Woman* (১৮৬৯) গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে এবং এর অবসানের দাবি করা হয়েছে।

উদারনৈতিক নারীবাদের প্রথম পর্বের প্রবক্তাগণ নারীবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করতেন না। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে **বেটি ফ্রায়ডান (১৯৬৩), র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস (১৯৮২)** প্রমুখ বেশ কিছু নারীবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কল্যাণকর উদারনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর জোর দেন। এঁদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, পরিবারের মতো ব্যক্তি পরিসরকে ন্যায়বিচারের ওপর স্থাপন করতে, যাতে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারে।

(২) মার্কসীয় নারীবাদ : মার্কসীয় নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধারার প্রবক্তাগণ (উইলসন, ১৯৯৩ ; শেলটন এবং অ্যাগার, ১৯৯৩ ; ফলব্রে, ১৯৯৩ প্রমুখ) এই মত পোষণ করেন যে, লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এঁদের মতে, সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের উৎসমূলে যে কারণটি বিদ্যমান সেটি জৈবিক নয়, অর্থনৈতিক। এঁরা মার্কসের **জার্মান ইডিওলজি এবং এঙ্গেলস্-এর ওরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যান্ড দ্য স্টেট** গ্রন্থদুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উভয় গ্রন্থেই লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে এইসব সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা দেখান যে, প্রাক্ কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত কোনো বৈষম্য ছিল না। যখন থেকে শ্রেণি বিভক্ত, শ্রম বিভাজিত সমাজ ধীরে ধীরে মূল উৎপাদন থেকে একদল নারীকে সরিয়ে দিল শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনে, পালনে এবং গৃহশ্রমে, তখন থেকেই এই শ্রেণির নারীরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হল বহির্জগৎ থেকে, হয়ে পড়ল গৃহবন্দি ও পরাধীন। আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। **শীলা রাওবাথান** (Shiela Rowbatham) প্রমুখ আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, শুধুমাত্র আইন করে বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন (total change of the existing system)।

(৩) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ : সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও লিঙ্গ বৈষম্য বা পিতৃতন্ত্রকে তাঁরা কোনো শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এঁদের মতে, পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবা ঠিক নয়। **জিলা আইজেনস্টাইন** (Z. Eisenstein) তাঁর *Capitalism Patriarchy and*

Scanned with CamScanner

the Case for Socialist Feminism (1979) নামক গ্রন্থে বলেছেন, নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হল দুটি—একটি পুরুষের আধিপত্য এবং অপরটি পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুদিক থেকে শোষিত হয়—একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা। তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ তা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান থাকে। তাই পুঁজিবাদী কাঠামোর বদল ঘটলেও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বদলায় না এবং লিঙ্গ বৈষম্য অব্যাহত থাকে।

অপর এক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী **হেইডি হার্টম্যান** (Heidi Hartmann) তাঁর *The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism (1997)* শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপভাবে বলেন, নারীর ওপর শোষণ ও নির্যাতনের উৎস হল দুটি—(১) বস্তুগত কাঠামো (অর্থনৈতিক) এবং (২) পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো (উপরিকাঠামো)। পিতৃতন্ত্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যা মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির পুরুষকে একই দলভুক্ত করতে এবং নারীদের শ্রম ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সুতরাং নারীবাদী সংগঠনগুলিকে এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে একই সঙ্গে পুঁজিবাদী ও পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে।

(৪) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism) : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের ধারণা যৌন পীড়ন এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত পুরুষের আধিপত্যের মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এঁরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতো পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করেন না ; আবার মার্কসবাদীদের মতো অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্বকে সমাজের মূল দ্বন্দ্ব বলে মনে করেন না; এঁদের বিশ্বাস সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব। বৈপ্লবিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা **জেফারি** (Sheila Jeffery)-র মতে, প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত লিঙ্গগত শ্রেণিবিভাগই পুরুষের আধিপত্যের কাছে নারীর বশ্যতার জন্য দায়ী। অপর এক নারীবাদী তাত্ত্বিক **সুসান ব্রাউনমিলার** (Susan Brownmiller) তাঁর *Against Our Willl : Men, Women and Rape (1976)* নামক গ্রন্থে বলেছেন, পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করতে সক্ষম বলেই নারী-পুরুষের বশীভূত। ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৭০-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের প্রসার ঘটলেও এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৯ সালে ফরাসি নারীবাদী **সিমোন দ্য বোভয়া** (Simone de Beauvoir)-র লেখা *The Second Sex* নামক গ্রন্থটির হাত ধরে। বোভয়া নারীকে চিহ্নিত করলেন সমাজে 'অপর' বা 'other' হিসাবে। নারীর এই 'অপর' বা 'other' ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনের কারণে। এই 'অপরত্ব' বা 'otherness' নারীর স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বোভয়ার ভাষায়, "ইতিহাস আমাদের দেখায় যে, পুরুষ সবসময় নিজের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে; পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই তারা নারীকে পরাধীন করে রেখেছে ; নারীর স্বার্থবিরোধী আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এইভাবে নারীকে 'অপর' (other)-এ পরিণত করা হয়েছে।" পরবর্তীকালে **ইভা ফিগস্, জারমেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট** প্রমুখ নারীবাদীরা বোভয়ার চিন্তা-ভাবনাকে আরও প্রসারিত করেন। এঁদের মতে, আমাদের সর্বস্তরে (ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়) পিতৃতান্ত্রিকতা পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন করেছে। **কেট মিলেট** তাঁর *Sexual Politics (1969)* গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। তিনি রাজনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞাকে খারিজ করে বলেন, **'Personal is Political'** অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতির অঙ্গ।

(৫) পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ (Eco feminism) : ১৯৭০-র দশক থেকে **'পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ'** (Eco feminism) নামক একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে পশ্চিমের দেশগুলিতে। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ ৮০-র দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই পরিবেশ সচেতনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক **বন্দনা শিবা**। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাতা হলেন **ফ্রাঙ্কোইসড ইউবোন** (Francoised Eubonne)। তিনি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে (between women and nature)

Scanned with CamScanner

একটা সম্পর্ক খুঁজে পান। তাঁর মতে, এরা উভয়েই অপরের আধিপত্যের (domination) শিকার। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে, আর প্রকৃতিকে মানুষের অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত ও নির্যাতিত হতে হয়। অপর এক পরিবেশ-সচেতন নারীবাদী **ওয়ারেন** (Karen J. Warren) একইভাবে মন্তব্য করেন যে, নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই যথাক্রমে পুরুষ ও মানুষের প্রভাবাধীনে থাকতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন, একের ওপর অন্যের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল দাস প্রথার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, কেউ জন্মায় শাসন করার জন্য, কেউ শাসিত হওয়ার জন্য। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আত্মা দেহকে শাসন করে, মানুষ পশুকে শাসন করে, আর পুরুষ নারীকে শাসন করে। **ওয়ারেন** এই ধরনের যুক্তিকে ('logic of domination') তীব্র বিরোধিতা করেন। বর্তমানে এই 'পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে পরিবেশ সমস্যা ও নারী সমস্যা উভয়েই স্থান পেয়েছে।

(৬) মানবতাবাদী নারীবাদ (Humanist Feminism) : এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে স্রেফ একটা আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে ('as accidental to humanity') দেখেন। তাঁরা মনে করেন, পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুযোগ দিতে হলে নারী-পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়াই উচিত। অন্যভাবে বললে, এঁরা নারীদের প্রতি বিশেষাধিকার দানের বিরোধী। **ম্যারি ম্যাকইনটোস** (Mary McIntosh), **মার্গারেট স্টেসি** (Margaret Stacey), **ম্যারিওঁ প্রাইস** (Marion Price), **রুথ লিস্টার** (Ruth Lister) প্রমুখ মানবতাবাদী নারীবাদীদের বক্তব্য হল এই যে, তথাকথিত 'সর্বজনীন অধিকার' এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান হলেও (যদিও কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার এখনও অস্বীকৃত), পৌর ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও রয়েই গেছে। কথা বলার অধিকার, চিন্তার অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার প্রভৃতি পৌর অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরিবারের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (within the private sphere of the family) এখনও পুরোপুরি সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেকারভাতা, পেনসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক অধিকারগুলিও পক্ষপাতদুষ্ট। তাছাড়া, এঁদের মতে, সাধারণভাবে সামাজিক অধিকারগুলি নির্মাণ করা হয় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ, নিরাপত্তার অধিকার, গর্ভনিরোধের অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার এই অধিকারগুলির প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনার মধ্যেই আনা হয় না। মানবতাবাদী নারীবাদীদের বিশ্বাস, পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

(৭) নারীসমস্যা কেন্দ্রিক নারীবাদ (Gynocentric Feminism) : অপর একধরনের নারীবাদী রয়েছেন যাঁদের বলা হয় **নারীসমস্যা কেন্দ্রিক নারীবাদী** (Gynocentric Feminists)। **এলিজাবেথ ওলগাস্ট** (Elizabeth Wolgast), **আইরিশ ইয়াং** (Irish Young), **ক্যাথলিন জোনস** (Kathleen Jones), **বেটিনা ক্যাশ** (Bettina Cass) প্রমুখ এই দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা। মানবতাবাদী নারীবাদীদের মতো এঁদেরও বক্তব্য হল, উদারনৈতিক কাঠামোয় যখন নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, তখন শুধুমাত্র পুরুষদের কথা মাথায় রাখা হয়, নারীদের নয়। ফলত নারীদের প্রতি অবহেলা দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেতন, কাজের সময়, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধার কথা বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে হয়, প্রসব করতে হয় এবং লালন করতে হয় নারীদেরই। সুতরাং এই বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে কঠোরভাবে সমরূপতা আনতে যাওয়ার অর্থই হবে নারীদের প্রতি অবিচার। **দ্বিতীয়ত,** এঁদের মতে, যতদিন ব্যক্তি-পরিসর ও গণ-পরিসরের মধ্যে বিভাজন থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিষ্ফল বাগাড়ম্বরের পর্যায়েই থেকে যাবে। সুতরাং প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু গণ-পরিসরের ক্ষেত্রে নয়, পরিবার এবং অন্যান্য ব্যক্তি-পরিসরের ক্ষেত্রেও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এককথায় Gynocentric

Scanned with CamScanner

Feminist-দের বক্তব্য হল, অসাম্যভিত্তিক পরিস্থিতিতে সমানাধিকার ও সমান সুযোগসুবিধা প্রতিষ্ঠার অর্থ হল অসাম্যকেই কার্যত প্রশ্রয় দেওয়া। তাই এঁদের মতে, নারীদের প্রতি সুবিচার করতে হলে মাতৃত্বের অধিকার (Maternity right), বিশেষ নিরাপত্তার অধিকার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা দরকার। এগুলিকে নারীদের 'বাড়তি অধিকার' হিসাবে না দেখে 'বাড়তি যত্ন' (extra care) হিসাবে দেখাই শ্রেয়।

(৮) বিনির্মাণবাদী নারীবাদ (Deconstructionist Feminism) ঃ অপর একদল নারীবাদী আছেন, যাঁদের বলা হয় **বিনির্মাণবাদী নারীবাদী** (Deconstructionist Feminists)। এঁদের মধ্যে আছেন **ক্যারল বাক্কী** (Carol Bacchi), **মারথা মিনো** (Martha Minow) প্রমুখ নারীবাদীগণ। এঁরাও নারীদের জন্য বিশেষাধিকার দানের বিরোধী, কারণ এঁদের মতে, এই বিশেষাধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাখবে। তাই তাঁরা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার ('same right within same situation')। উলটোভাবে বললে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে। এইভাবে দেখলে সমানাধিকার এবং বিশেষাধিকারের মধ্যেকার পার্থক্যটি অন্তর্হিত হবে। **মারথা মিনো** তাঁর *'Making All the Differences' (1990)* গ্রন্থে সমানাধিকার ও বিশেষ অধিকারের মধ্যে বিভাজন-এর ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সমান অধিকার ও বিশেষ অধিকার এদুটির মধ্যে যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কোনো মানে নেই। বরং যে পরিস্থিতিতে যে অধিকার সবচেয়ে উপযোগী সেটাই দেওয়া দরকার।

উপসংহার ঃ উপরিউক্ত ধারাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে, তবে নারীদের অসম অবস্থানের বিষয়টি যে অনৈতিক, সে বিষয়ে সকলে একমত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নারীবাদ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সম্পর্কে গণচেতনা জাগাতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৫ সালটিকে **'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ'** (International Women's Year) এবং ১৯৭৬-৮৬-কে নারী-দশক হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং নারীবাদী আন্দোলন ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকে। প্রথমদিকে এই আন্দোলন মূলত পশ্চিমি দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনুন্নত দেশের মেয়েরাও পথে নেমেছে। আন্দোলনের সাথে চলেছে আত্মানুসন্ধান।

১৮.৩ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান
The status of women in Indian Society

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান কীরূপ—এ প্রশ্নের উত্তর দান মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান চিরকাল এক খাতে বয়ে চলেনি। প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতীয় নারী যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত পরবর্তীকালে তার অবক্ষয় ঘটে। সুলতানি ও মোঘল আমলে সাধারণ ভারতীয় নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, স্বনির্ভর মহিলাদের অবস্থান উন্নতি হলেও, দেশের অগণিত দরিদ্র ও অশিক্ষিত মহিলারা চরম অবজ্ঞা, অবিচার ও নির্যাতনের শিকার।

প্রাচীন বৈদিক যুগে সমাজে নারীদের বিশেষ স্থান ছিল। অথর্ব বেদে দেখা যায়, নারীরা একদিকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করছে, আবার অন্যদিকে যাগযজ্ঞ এবং বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে যোগ দিচ্ছে। এই যুগে মনে করা হত ব্রহ্মা এক। তার দুই রূপ—পুরুষ ও নারী। একই আত্মা যখন যে শরীরে যুক্ত হয় তখন সে সেই রূপ নেয়। রামায়ণ, মহাভারতের যুগেও নারীদের পুরুষদের পাশাপাশি যাগযজ্ঞে অংশ নিতে দেখা যায়। **গান্ধারী ও কুন্তী** দুজনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণা, বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। দ্রৌপদীর ধর্মে ও নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান সুপরিচিত। মহাভারতের সময় স্বয়ংবর সভার রেওয়াজ ছিল। সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী এঁরা সকলেই নিজেদের পছন্দ করা ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন। যুদ্ধ বিদ্যায়, শিক্ষাদানে, নারীদের পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে **বৈদিক যুগের শেষের দিকে** নারী স্বাধীনতা ক্রমশই খর্ব হতে থাকলো। কতিপয় মুনি ঋষি সমাজের

Scanned with CamScanner

ওপর বিশেষ করে নারীদের ওপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত **'মনুসংহিতা'** নারী স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। নারীর শিক্ষার অধিকার, যাগযজ্ঞের অধিকার খর্ব করা হয় এবং নারী চরিত্রের ওপর নানারূপ আক্রমণ করা হয়। বিবাহে স্বয়ংবর প্রথা উঠে গেল। নারীশিক্ষার প্রসার আটকাতে এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে বাধা দিতে চালু হল বাল্যবিবাহ। বৈধব্য প্রথার কড়া অনুশাসন মানতে বাধ্য করা হল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহমরণের কথাও শোনা যায়। বৈদিক যুগের অবসানে কন্যারা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল।

সুলতানি আমলে ভারতে নারীদের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। দুর্বল হিন্দু রাজারা নারীদের রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়ায় 'জহর ব্রত' অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথা চালু হয়। হিন্দুদের ঘোমটা ও মুসলমানদের পর্দা ও বোরখার ব্যবহার প্রায় আইনি পর্যায়ে চলে যায়। ধনী পরিবারে হিন্দুরা একাধিক বিবাহ করত, রাজারা শত শত স্ত্রী বা দাসী রাখত। মুসলমানদের চারটে বিবাহ তো ধর্মীয় আইনসিদ্ধই ছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দিরে সুন্দরী মেয়েদের জোর করে দেবদাসী করে রাখার প্রথা চালু হয়। ফলে সমাজে নারীশিক্ষা তো দূরের কথা, রাস্তাঘাটে বেরোনো পর্যন্ত তাদের বন্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজরা ভারতে আসার পর অবস্থার খুব একটা হেরফের ঘটেনি। নারীশিক্ষা প্রবর্তনে, বিধবাবিবাহ প্রচলনে, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা রোধে ইংরেজরা যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেও ব্রিটিশ শাসকরা কখনই ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনে উৎসাহ দেখায়নি। বরং তারা এ ব্যাপারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। তাই বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, পরিবার, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা প্রচলিত হিন্দু আইন, মুসলিম আইন ইত্যাদিকে বজায় রেখে চলে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীরাই প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক আইনকানুনের জাঁতাকলেই পিষ্ট হতে থাকে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করা হল এবং গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হল। কিন্তু ধর্ম ও বৈষম্যভিত্তিক চিরাচরিত জাতীয় সমাজব্যবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল। ফলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল থেকেই গেল এবং এই গরমিল সবচেয়ে বেশি প্রকট হল লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করা হল। সংবিধানের ১৪ নং এবং ১৫নং অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের কথা বলা হল এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সংবিধানের কোথাও বলা হল না যে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভারতীয় নারী যে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের শিকার হয় তার অবসান ঘটানো হবে। কোথাও বলা হল না যে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন করা হবে। পরিবার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি ও নিয়মকানুনকে আগের মতোই বহাল রাখা হল।

পরবর্তীকালে **পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে** অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উদ্যোগে হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)-দুটি পাশ করে সম্পত্তি, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানো হয় ঠিকই, কিন্তু নারী-পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আইন যথেষ্ট ছিল না। মুসলিম মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলাকে তার স্বামী খুব সহজেই তালাক (divorce) দিতে পারত এবং উক্ত আইনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ও তার সন্তানদের খোরপোশের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্বাধীন ভারতে উক্ত আইন অপরিবর্তিত থাকল। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক শাহবানু মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্ট তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের খোরপোশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করলে সারা দেশের মৌলবাদী মুসলমানরা হৈ হৈ করে এর প্রতিবাদ করে। দেশের মুসলিম ভোটকে নিশ্চিত করার হীন স্বার্থে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধি সরকার মুসলিম শরিয়তি আইন, ১৯৮৬, পাশ করে মুসলিম মহিলাদের পুনরায় পূর্বেকার অসহায় অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে খ্রিস্টান মহিলাদের অবস্থাও তথৈবচ। ১৮৬৯ সাল প্রণীত আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা ছিল পক্ষপাতমূলক এবং মহিলা স্বার্থবিরোধী। আজ পর্যন্ত সেই আইন অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

Scanned with CamScanner

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী খ্রিস্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মহিলাদেরই পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে বিরাজ করতে হয়।

বস্তুতপক্ষে, **স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও** ভারতীয় সমাজ পুরুষ আধিপত্যকারী সমাজ হিসাবেই রয়ে গেছে। এখনও ভারতের **সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থায়** সাবেকি মূল্যবোধগুলিকে সযত্নে লালন করা হয়ে থাকে। পরিবারের ক্রমবিন্যাস্ত কাঠামোয় নারীর স্থান পুরুষ সদস্যদের নীচে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনোও ভূমিকা থাকে না। এখনও স্ত্রীর মর্যাদা তার স্বামী ও পরিবারের মর্যাদা অনুসারে নির্ধারিত হয়, তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা গুণাবলির ভিত্তিতে নয়। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও** নারীকে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয়। একই পরিশ্রম করেও নারীকে পুরুষের থেকে কম মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অর্থনীতিতে যত আধুনিকীকরণের অনুপ্রবেশ ঘটছে, মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তত কমছে।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে। ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় ভূমিকার অভাব লক্ষ করা যায়। আসলে এর জন্য দায়ী ভারতীয় সমাজের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। ছোটোবেলা থেকে ভারতীয় নারীর মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, নারীর উপযুক্ত স্থান হল গৃহকোণ, বাড়ির বাইরেটা নারীর বিষয় নয়, ওটা পুরুষদের বিষয়। রাজনীতি যেহেতু বাইরের বিষয়, সেহেতু রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের কোনোও প্রশ্ন নেই।

সুতরাং ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে চিত্রটি আমরা পাই সেটি হল এই যে, **একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানে খুব একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।** ভারতবর্ষে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর নারীর সংখ্যাও কম, নারীত্বের ভারে জর্জরিত না হওয়া সচেতন নারীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় বললেই চলে, কিন্তু নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা, অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা, মার খাওয়া নারীর সংখ্যা অগুনতি। ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা **ডঃ বুলা ভদ্রের** মতে, "স্বাধীন, পঞ্চাশোর্ধ, পৌঢ় ভারত আর কিছুতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারুক, নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের খাতায় সুস্পষ্টই বড়ো রকমের হিসাব রাখতে সক্ষম হয়েছে।"

তবে অতি সম্প্রতি ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানের অচলায়তনটি একটু নড়তে শুরু করেছে। মৌলিক কিছু পরিবর্তন না ঘটলেও ভারতীয় নারীর মানসিকতায় এক ধরনের পরিবর্তনের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে কিছুটা চেতনা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমি দেশগুলিতে যে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন আগে, সাম্প্রতিককালে ভারতে তার ঢেউ আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। শিক্ষাদীক্ষায়, খেলাধুলায়, বিজ্ঞান চর্চায়, রাজনীতিতে ভারতীয় নারীকে কিছুটা এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। নারী- পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নানান ব্যবস্থা গৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে। তবে যতদিন না ভারতীয় নারীরা শিক্ষিত ও আর্থিক স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, ততদিন নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যের বিষয়টি অধরাই থেকে যাবে। নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, নারীশিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বীতা অর্জন ব্যতিরেকে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটা সম্ভব নয়।

১৮.৪ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানে ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি
The measures taken by the Indian State to wipe-off the gender discrimination prevailing in Indian Society

দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে যে সামাজিক কাঠামোটি প্রচলিত আছে, সেটি বলা বাহুল্য, লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় যৌথ পরিবারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকরাও এদেশে প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনে তেমন একটা হস্তক্ষেপ করেনি। বিবাহ, পরিবার ব্যবস্থা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যে নিয়ম ছিল, সেই নিয়মকেই মোটের ওপর বজায় রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু আইন বলতে ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা পরিচালিত নিয়মকানুনকেই বুঝত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ আমলেও ভারতীয় নারীদের পুরুষদের তুলনায়

Scanned with CamScanner

অধস্তন সামাজিক অবস্থানে বিরাজ করতে হয়। বলা বাহুল্য, মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বও ভারতীয় নারীর অসম সামাজিক অবস্থান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাননি। তাঁরা দেশ উদ্ধারের কাজে বীরাঙ্গনা নারীদের সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি যে নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহকোণ।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করা হল এবং গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হল। কিন্তু ধর্ম ও বৈষম্য ভিত্তিক চিরাচরিত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল। ফলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল থেকেই গেল এবং এই গরমিল সবচেয়ে বেশি প্রকট হল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করা হল। সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নং অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের কথা বলা হল এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ১৬ নং অনুচ্ছেদ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা বলা হল। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিতে সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা এবং স্ত্রী-পুরুষের সমান কাজে সমান মজুরি প্রদানের কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু সংবিধানের কোথাও বলা হল না যে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভারতীয় নারী যে সামাজিক অন্যায় অবিচারের শিকার হয় তার অবসান ঘটানো হবে। কোথাও বলা হল না যে, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন করা হবে। পরিবার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি ও নিয়মকানুনকে আগের মতোই বহাল রাখা হল। নেহেরু, আম্বেদকর প্রমুখ কোনো কোনো নেতা অবশ্য চেয়েছিলেন প্রচলিত হিন্দু আইনকে সংশোধন করে সম্পত্তি ও বিবাহের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে। এই মর্মে একটি প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। কিন্তু গোঁড়া হিন্দু প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায়, গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া তৎকালীন ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই চাইতেন প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে অটুট রাখতে।

পরবর্তীকালে **পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে** অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উদ্যোগে হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)-দুটি পাশ করে সম্পত্তি, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানো হয় ঠিকই, কিন্তু নারী-পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আইন যথেষ্ট ছিল না। মুসলিম মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মুসলমান মহিলাকে তার স্বামী খুব সহজেই 'তালাক' (divorce) দিতে পারত, স্বাধীন ভারতেও উক্ত আইন অপরিবর্তিত থাকল এবং উক্ত আইনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ও তাঁর সন্তানদের খোরপোশের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি মহিলার পক্ষে এই ধরনের আইনের ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৮৫ সালে **ঐতিহাসিক শাহবানু মামলার** রায়ে সুপ্রিমকোর্ট তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের খোরপোশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করলে সারা দেশের মৌলবাদী মুসলমানরা হৈ চৈ করে এর প্রতিবাদ করে। দেশের মুসলিম ভোটকে নিশ্চিত করার হীন স্বার্থে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধি সরকার মুসলিম শরিয়তি আইন, ১৯৮৬, পাশ করে মুসলিম মহিলাদের পুনরায় পূর্বেকার অসহায় অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি অঙ্গীকার অন্তত খাতায় কলমে কোনো দেশের থেকে কম নয়। পণ প্রথা নিবারণে, ধর্ষণ প্রতিরোধে, বধূ নির্যাতন প্রতিরোধে, সতীদাহ নিষিদ্ধকরণে, শ্লীলতাহানি বন্ধে, আরও নানা বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। গত শতাব্দীর ৮০-র দশকে নারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যেকটি ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত আইন ছিল, সেগুলির প্রায় সবকটিই সংশোধন করা হয় এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কিছু নতুন আইন সংযোজন করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বধূ নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সংক্রান্ত আইন ও সংশোধনী (১৯৮৩, ১৯৮৬), ধর্ষণ আইন সংশোধনী (১৯৮৬), পণপ্রথা নিবারণী আইন সংশোধনী (১৯৮৪, ১৯৮৬), শ্লীলতাহানি সংক্রান্ত আইন (১৯৮৬, ১৯৮৭), সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (১৯৮৭), ইত্যাদি। ১৯৮৮ সালে মহারাষ্ট্র সরকার এবং রাজস্থান সরকার ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ করে এবং ১৯৯৬ সালে সারা ভারতে এই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়।

Scanned with CamScanner

এইসব আইন ও সংশোধনী নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তির মাত্রাকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুলেছে। তাই আশা করা হয়েছিল এইসব আইন নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ও নির্যাতনের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়ে দেবে। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। বাস্তবে আমরা দেখেছি, এইসব আইন প্রণীত হওয়ার দরুণ নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ ও নির্যাতন কমেনি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল এই যে, নারী নির্যাতনে একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে রাষ্ট্রেরই। অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের ওপর আমরা নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ভরসা রাখি, স্বাধীন ভারতে সেই রাষ্ট্রই নির্যাতনকারীর ভূমিকায়। বিভিন্ন সময়ের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এই দেশে ধর্ষণকারীর তালিকায় শীর্ষে আছে পুলিশের নাম। রক্ষক এখানে ভক্ষক। যে পুলিশের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা, সেই পুলিশই সুরক্ষা দেওয়ার বদলে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধে লিপ্ত। মধ্য প্রদেশের হাইকোর্টে একটি হেফাজাতি ধর্ষণের মামলায় রায়দান কালে মুখ্য বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের পুলিশ দেশের সব থেকে বড়ো সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী।'

নারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচার দু-রকম চেহারা নেয়—(১) শারীরিক নির্যাতন এবং (২) যৌন নিগ্রহ। ব্রিটিশ আমলে তমলুকে ৪২-এর আন্দোলনে অসংখ্য নারী এভাবে নিগৃহীতা হন। একই ঘটনা ঘটে কুখ্যাত নীল বিদ্রোহের সময়। আর তেভাগা আন্দোলনে ইলা মিত্রের ওপর বীভৎস অত্যাচার আজ ইতিহাস। স্বাধীন ভারতেও সেই ট্রাডিশন অব্যাহত। ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৯-এ কলকাতার রাজপথে গর্জে উঠেছিল স্বাধীন ভারতের পুলিশের গুলি। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চার নেত্রী অমিয়া, প্রতিভা, লতিকা ও গীতা নিহত হন। তাঁদের অপরাধ, জেলে অনশনকারী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সমর্থনে তাঁরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে অসীমা পোদ্দারের ওপর চলে পুলিশি নির্যাতন ও ধর্ষণ। জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করায় মলয়া ঘোষ, রাজশ্রী দাস গুপ্ত, কৃষ্ণাদের লকআপে ভরা হয় এবং সেখানে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। একই অপরাধে বাঙ্গালোরে নিহত হন অভিনেত্রী স্নেহলতা রেড্ডি। চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, আসামের ভাষা আন্দোলন, মণিপুর, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যের উগ্রপন্থী আন্দোলন ইত্যাদি দমনে সেনাবাহিনী ও পুলিশের একই অত্যাচারী ভূমিকা। আজ থেকে ৬৬ বছর আগে ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ আমলে ধান-চালের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মণিপুরী নারীদের জঙ্গী আন্দোলন যেভাবে দমন করা হয়েছিল আইন শৃঙ্খলার অজুহাতে, তার সঙ্গে আজকের সেনাবাহিনীর জনবিরোধী ভূমিকার কোনো তফাত আমরা দেখতে পাইনা। সরকারি হোম এবং জেলে নারীর ওপর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যে ধরনের অত্যাচার করে তা গণতন্ত্রের পক্ষে কলঙ্ক।

ভারতবর্ষের নারী সংগঠনগুলি এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে যতখানি সরব থাকেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ততটা নয়। এর একটা বিপজ্জনক দিক আছে। রাষ্ট্রীয় হিংসা পারিবারিক হিংসার আড়ালে থেকে নিজের কাজ চালিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর নারী সদস্যদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে একমাত্র গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার রক্ষা সংগঠনগুলি। নারী সংগঠনগুলির কোনো ভূমিকাই এযাবৎ লক্ষ করা যায়নি, কারণ তাদের নানা সময়ে সরকারি সহযোগিতার দরকার হয়।

এছাড়া ভারতীয় নারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পক্ষপাতিত্বের আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব সমান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মূলত নারীকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে, পুরুষকে নয়। সমস্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণে নারীকে বাধ্য করা হয়েছে ; কখনো-কখনো সরকার দমনমূলক নীতি ও জোর জবরদস্তির রাস্তা নিয়েছে। কর্মী নারীর অধিকার সংকুচিত করতে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় সন্তানের পর প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে নানা রকম ক্ষতিকারক গর্ভ নিরোধক নারীর শরীরে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় শরণার্থী নারীদের ওপর যৌন নিগ্রহ ছাড়াও তাদের ওপর পরীক্ষামূলক গর্ভ নিরোধক প্রয়োগের ঘটনার কথা জানা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রের ভূমিকা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিছু আইনকানুন প্রণয়ন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আইনকে যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হয় সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার।

Scanned with CamScanner

১৮.৫ ভারতে নারী আন্দোলনের একটি রূপরেখা
A write-up on the Feminist Movement in India

ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের সূচনা, প্রকৃতি এসব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। কারও কারও মতে, ভারতে নারী আন্দোলনের শুরু আঠারো এবং উনিশ শতক থেকে। আবার অপর একদল চিন্তাবিদের মতে, ভারতীয় নারীর জীবনবোধে মুক্তির চেতনা আসে গত শতকের সত্তরের দশক থেকে। প্রথমোক্তদের দাবি, আঠারো এবং উনিশ শতকে ভারতে যেসব সমাজ সংস্কার আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্য দিয়েই ভারতে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত। যদিও ওইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পুরুষরা, পরবর্তীকালে তাঁদেরই স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্যরা মহিলাদের অসহায় অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য চেষ্টা করেন। সমাজের উচ্চবিত্ত কিছু মহিলা সমাজ-সংস্কারের কাজে পুরুষদের সঙ্গে হাত মেলান। এ ব্যাপারে **পণ্ডিতা রামাবাই**-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিধবাদের অবস্থা ও তাদের স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ এবং বিবাহে নারীর সম্মতি—প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর রামাবাই গুরুত্ব দেন। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসার ও নারীদের সামাজিক ও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনগুলি পরিচালিত হয়েছিল, তা নারীমুক্তির প্রসার ঘটাতে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তদানীন্তনকালে যেসব আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে যথেষ্ট সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ওই সময় ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী, বিকাজি রুস্তম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী নারীমুক্তির জন্যে এগিয়ে আসেন। ভারতে ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৭ সালে এবং ওই বছরই সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা, ভোটাধিকার ইত্যাদির দাবিতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড মিশনের কাছে একটি প্রতিনিধি দল যায়। একই সঙ্গে ১৯১৭ সালেই মার্গারেট কুইন্সি-র নেতৃত্বে Women's Indian Association গঠিত হয়। এরপর ১৯২৬ সালে All India Women's Conference গঠিত হয়। All Indian Women's Conference-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় পুনেতে, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করা হয়। সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃতা কাউর, রেণুকা রায়, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, রামেশ্বরী নেহেরু, মহারানি চিমনবাই গাইকোয়াড়, বেগম হামিদ আলি প্রমুখ এই Conference-এর নেতৃত্ব দেন। এই Conference থেকে তিনজন মহিলা প্রতিনিধি ব্রিটেনের একটি উল্লেখযোগ্য নারীসংগঠন International Alliance of Women-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। তখন থেকেই ভারতে নারী আন্দোলন একটি সংগঠিত রূপলাভ করে।

১৯৩০-এর দশকে একদিকে চরমপন্থী কার্যকলাপ এবং অন্যদিকে গান্ধিজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওই সময় বেশ কিছু নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন নিখিল জাতীয় নারী সংঘ, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, নারী সত্যাগ্রহ কমিটি ইত্যাদি। ওইসব সংগঠন রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল। ওই সময় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জোরালো।

স্মরণ রাখতে হবে, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে যে নারী আন্দোলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক প্রকৃতির। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ওইসব আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ওই সময়কার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং অন্যান্য সশস্ত্র সংগ্রামগুলি নারীদের ইস্যুগুলিকে যে সবসময় তুলে ধরেছিল তা নয়। বস্তুতপক্ষে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নারী সমস্যার দিকে খুব একটা দৃষ্টিপাত করা হয়নি—কী রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে, কী নারী সংগঠনগুলির তরফ থেকে।

ভারতে নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব :

ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার শুরু থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত আন্দোলনগুলি ভারতে নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

Scanned with CamScanner

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় নারীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছিল, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দু'দশকে তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে। এই সময়ে মহিলারা আগের মতোই গৃহস্থালি কাজকর্মে বেশি মনোযোগ দেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিছু সমাজকল্যাণকর কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। যেসব মহিলা মন্ত্রীপরিষদে স্থান পেয়েছিলেন, তাঁরা স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রভৃতি দপ্তরগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেসব মহিলা সমিতি টিম টিম করে চলছিল, সেগুলি সরকারের লেজুড়ে পরিণত হয়। **'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'** (AIWC)-এর মতো সংগঠন অনৈক্য, দলাদলি এবং অন্যান্য কারণে ভেঙে যায়। এককথায়, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে ভারতের মহিলারা রাজনীতির কঠিন জায়গাটি পরিত্যাগ করে আগের মতো 'সেবা'র আদর্শে ফিরে যান।

শ্রীমতী বন্দনা চ্যাটার্জী তাঁর *'Women and Politics in India'* প্রবন্ধে স্বাধীনতা লাভের পরের দু'দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর নির্লিপ্ততার কারণ হিসাবে এক ধরনের বিশ্বাসকে দায়ী করেছেন। ওই সময়ে ভারতীয় মহিলারা এবং তাঁদের সংগঠনগুলি নয়া ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন এই নতুন রাষ্ট্রটি নিজের থেকে প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন ঘটাবে এবং নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নারী ১৯৭০-এর দশক থেকে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

এযুগের নারী আন্দোলনগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধের নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে ন্যূনতম করা। ১৯৭০-এর নারী জাগরণের পশ্চাতে কতকগুলি উপাদান কাজ করেছে, যেমন—(১) এই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ডাক, (২) ১৯৭৪ সালের রেলওয়ে ধর্মঘট, (৩) জরুরি অবস্থায় নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, (৪) ভারতীয় নারীর অবস্থান সংক্রান্ত কমিটির (Committee on the Status of Women in India) প্রতিবেদনে নারীর অসম ও অবহেলিত অবস্থান সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ, (৫) 'মথুরা ধর্ষণ মামলা' ইত্যাদি। এইসব ঘটনা ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ও শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত নারীদের ভীষণভাবে সক্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন নারী সম্মেলনের আয়োজন করে। মহারাষ্ট্রে স্বামীদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং স্ত্রীপ্রহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ছোটো ছোটো মহিলা 'শিবির' গড়ে তোলা হয়। তবে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী আন্দোলনের পন্থা-পদ্ধতি স্থির করে দিত মূলত পুরুষরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি।

নারী আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ঃ ভারতের নারী আন্দোলনে নারীদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভূমিকা শুরু হয় ১৯৮০-র দশক থেকে। তাই অনেকে এই পর্যায়ের আন্দোলনকে ভারতের নারী আন্দোলনের **তৃতীয় পর্যায়** বলে অভিহিত করেন। এই পর্যায়ে ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যাদের কাজ হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, চাকরি, মজুরি এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

এই সময় ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের **তিনটি ধারা লক্ষ করা যায় ঃ উদারপন্থী, বামপন্থী এবং র‍্যাডিক্যাল।** উদারপন্থীরা আইনি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বামপন্থী নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন। আর র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন। এই সময় বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা ভারতের নারীবাদী আন্দোলনগুলিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, যথা—আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন এবং জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবি ও বেজিং শহরে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনগুলি।

মূল্যায়ন ঃ সমালোচকেরা ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের কতকগুলি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঃ

প্রথমত, স্বাধীনতার আগে নিছক নারী সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নারীদের মধ্যে তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বানে হাজার হাজার মহিলা ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছেন, প্রাণপণে লড়াই করেছেন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে তাঁরা কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেননি।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের নারী আন্দোলনগুলি স্তিমিত হয়ে যায়। নারী সমস্যা সমাধানে

Scanned with CamScanner

ভারতীয় মহিলারা ওইসময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের (যেখানে নারীর সংখ্যা নগণ্য) ওপর অতি বেশি আস্থা রেখেছিলেন।

তৃতীয়ত, গত শতকের ৮০-র দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের প্রসার ঘটলেও মতাদর্শগত এবং পন্থা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিরোধের ফলে নারী আন্দোলনগুলি খুব একটা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

চতুর্থত, ভারতের নারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হল, এই আন্দোলন মূলত শহরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ফলে দেশের অগণিত দরিদ্র, অশিক্ষিত মহিলা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেছে। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের দেওরালাতে রূপ কানওয়ারের সহমরণ বা সতীত্বের ঘটনাটি ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের দুর্বলতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের আবেদন ভারতের প্রতিটি নারীর কাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়েছে।

পঞ্চমত, জাত পাত, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাব ইত্যাদিও ভারতের নারীবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে রেখেছে। ১৯৮৫ সালের ঐতিহাসিক শাহ্‌বানু মামলার রায়কে অতিক্রম করে তৎকালীন ভারত সরকার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যখন শরিয়তি আইন প্রণয়ন করল, তখন ভাবা হয়েছিল ভারতীয় মহিলারা এই আইনকে সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করবে। কিন্তু দেখা গেল, অ-মুসলমান মহিলারা বিষয়টি মুসলিম মহিলাদের নিজস্ব ব্যাপার বলে এড়িয়ে গেল। আর মুসলিম মহিলারা মৌলবাদীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নিষ্ক্রিয় থাকল।

ষষ্ঠত, ভারতের বেশিরভাগ নারীবাদী সংগঠন হয় কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা হিসাবে কাজ করেছে অথবা কোনো দলের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে কাজ করেছে। ফলে ওইসব সংগঠন নারী আন্দোলনে স্বাধীন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরিউক্ত দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে গেলে যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি হল, ভারতের নারীবাদী সংগঠনগুলিকে তথা নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আরও বেশি স্বাধীন ভূমিকা পালনে আগ্রহী হতে হবে। বিশেষ কোনো দল বা সংগঠনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।

১৮.৬ ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ
The women's participation in Indian politics

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ধারাটি বরাবর একই খাতে বয়ে যায়নি। স্বাধীনতার আগের কয়েক দশকে ভারতীয় নারীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরের দু'দশকে ভারতীয় নারী বিভিন্ন কারণে রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১৯৭০-এর দশক থেকে পুনরায় ভারতের নারী এবং বিভিন্ন নারী সংগঠন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক, ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে নিম্নোক্ত দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করে দেখানো হল।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব (Pre-independent period) :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভারতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছিল, ভারতীয় নারীর সঙ্গে রাজনীতির যোগ সেখান থেকেই শুরু। ওই সময় যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তা একদিকে নারীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল এবং অন্যদিকে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে বিদূরিত করতে চেয়েছিল। তবে ওইসব আন্দোলনের সঙ্গে যেসব নারী জড়িত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় কিছু মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল যাদের নেতৃত্বে ছিলেন **নলিনী দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী** প্রমুখ। অন্যদিকে মাদ্রাজে গড়ে উঠেছিল কতিপয় মহিলা সংগঠন, যথা—**উইমেনস্ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন** (WIA, 1917), **অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স** (AIWC, 1927) ইত্যাদি। এইসব মহিলা সমিতি ও সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর স্বাধীন অস্তিত্বকে তুলে ধরা। এইসব উদ্যোগের পরিণতিস্বরূপ মহিলারা ক্রমশ বেশি বেশি করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে, বিশেষ করে **ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির যোগদানের সময় থেকে।** গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সমস্ত স্তরের হাজার হাজার ভারতীয় রমণী ঘরের বাইরে পা রাখেন। তাঁরা মিছিলে যোগ দেন, মদের দোকানে পিকেট করেন, জেল খাটেন এবং লাঠি-গুলির মুখোমুখি হন। এমনকি শিশু সন্তানদের কোলে নিয়েও বহু মা জেলে গেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামীদেরও ভারতীয় মহিলারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন পলাতকদের আশ্রয় দিয়ে, গোপন অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে, বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর সরবরাহ করে ইত্যাদি নানাভাবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে **কল্পনা দত্ত, কণকলতা বরুয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** প্রমুখ বীরাঙ্গনা নারীকে সরাসরি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত গান্ধিজির খাদি আন্দোলন ভারতীয় নারীদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করে। তাঁরা বিদেশি বা মিলের শাড়ি পরিত্যাগ করে খাদিবস্ত্র পরিধান করতে থাকেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ এবং স্বাধীনোত্তর যুগ—এই দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কয়েকটি স্থানে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়, যেমন বাংলায় **তেভাগা আন্দোলন** (১৯৪৬-৫০), অন্ধ্রপ্রদেশে **তেলেঙ্গানা আন্দোলন** (১৯৪৮-৫১) ইত্যাদি। উভয় আন্দোলনেই গ্রামের মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা নারী বাহিনী গঠন করেন এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনোত্তর পর্ব (Post-independent Period) :

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় নারীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছিল, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দু'দশকে তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে। এই সময়ে মহিলারা আগের মতোই গৃহস্থালি কাজকর্মে বেশি মনোযোগ দেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিছু সমাজকল্যাণকর কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। যেসব মহিলা মন্ত্রীপরিষদে স্থান পেয়েছিলেন, তাঁরা স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রভৃতি দপ্তরগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেসব মহিলা সমিতি টিম টিম করে চলছিল, সেগুলি সরকারের লেজুড়ে পরিণত হয়। '**নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন**' (AIWC)-এর ন্যায় সংগঠন অনৈক্য, দলাদলি এবং অন্যান্য কারণে ভেঙে যায়। এককথায়, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে ভারতের মহিলারা রাজনীতির কঠিন জায়গাটি পরিত্যাগ করে আগের মতো 'সেবা'র আদর্শে ফিরে যান।

ভারতের নারী আন্দোলনে নারীদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভূমিকা শুরু হয় ১৯৮০-র দশক থেকে। তাই অনেকে এই পর্যায়ের আন্দোলনকে ভারতের নারী আন্দোলনের **তৃতীয় পর্যায়** বলে অভিহিত করেন। এই পর্যায়ে ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যাদের কাজ হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, চাকরি, মজুরি এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল সাধারণ নির্বাচনে **নারীর অংশগ্রহণ।** এ বিষয়ে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতামত শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, **এস. ডি. মুনি** (S. D. Muni) কর্তৃক প্রণীত *Women in the Electoral Process* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম। **মিলব্রাথ ও গোয়েল** (L. W. Milbrath and M. L. Goel) প্রণীত *Political Participation* নামক গ্রন্থে একই ধরনের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী। অপরদিকে **ডঃ সঙ্ঘমিত্রা সেন চৌধুরী** তাঁর *Women and Politics : West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে দাবি করেছেন, সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা পুরুষের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। তিনি দেখিয়েছেন, জরুরি অবস্থার পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে মহিলাদের প্রদত্ত ভোটের হার পুরুষদের থেকে বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার বেশি। অন্যভাবে বললে ভোট না দেওয়ার প্রবণতা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে বেশি।

Scanned with CamScanner

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সূচক হল **আইনসভায় মহিলা সদস্যদের সংখ্যা এবং ভূমিকা**। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষেই মহিলা সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট কম। লোকসভাতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় একই জায়গায় রয়ে গেছে। এই সংখ্যাটি বরাবর ৯ শতাংশের নীচে থেকে গেছে। রাজ্যসভাতে একই চিত্র দেখতে পাই। সেখানেও দেখা যায়, মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কখনই ১০ শতাংশের সীমা ছাড়ায়নি। কারও কারও মতে, ভারতের সংসদে মহিলা সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার জন্য দায়ী রাজনৈতিক দলগুলি। নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আস্ফালন করলেও কোনো দলই মহিলাদের জন্য ব্যাপক হারে লোকসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীপদ উন্মুক্ত রাখেনি। কংগ্রেস দল ১৯৩১ সালের করাচি অধিবেশনেই নারীদের জন্য সমানাধিকার দাবি করে। স্বাধীনতার পরও এই দল প্রথম লোকসভা নির্বাচনে অন্তত ১৫% প্রার্থীপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলেছিল। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে **পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানটি কী।** সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে সকল স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। জনজীবনে ব্যাপক নারী প্রতিনিধিত্বের এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা এখানে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মহিলা প্রার্থীরা জনসমর্থনের আশায় মিটিং-মিছিল করেছেন, প্রচার চালিয়েছেন দরজায় দরজায়। তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে এই ধরনের পরিবর্তন নারীকে দিয়েছে সাহস, সামাজিক স্বীকৃতি ও কিছু ক্ষমতা। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, পরিচালনা ও পরিষেবার ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা ভালো কাজকর্ম করছেন। তাঁরা গার্হস্থ্য কাজকর্ম সামলে নিয়মিত সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন এবং দক্ষতার সঙ্গে বহু দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সকল রাজ্যে সমান নয়। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচনি পর্যায়ে সামিল হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে অল্প বিস্তর অনীহা দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, গরিব কৃষিজীবী পরিবারের নিরক্ষর বা অশিক্ষিত মহিলাদের পঞ্চায়েতী কাজকর্মে অংশগ্রহণের হার ও মান অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে।

রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষস্থানীয় সংগঠনে মহিলাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ১৯৯৬ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মহিলা ও পুরুষদের সংখ্যা হল যথাক্রমে ২ এবং ১৮ জন। বি.জে.পি-র জাতীয় কার্যকরী কমিটির ১৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন মাত্র মহিলা। সি.পি.আই.(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ৭২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা। সি.পি.আই-এর জাতীয় কার্যকরী কমিটির ৩১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন মহিলা। জনতা দলের জাতীয় কার্যকরী কমিটির ১৪৭ জনের মধ্যে ১১ জন মহিলা আছেন।

১৯৯৬-এর ১২ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব সম্বলিত একটি সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেন। বিলটি অনুমোদিত হলে সংসদে ৩৩% মহিলা সাংসদ থাকতেন অর্থাৎ লোকসভায় ১৮০ জন। রাজনীতিতে তাহলে নারীর অবস্থান এক সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছাতো। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে এই বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি এবং তারপরও কয়েকবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আসলে আইনসভার অধিকাংশ পুরুষ সদস্য এ ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন। তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, প্রাক্-নিবাচন পর্বের প্রতিশ্রুতি মতো সংরক্ষণ কার্যকর হলে তাঁদের আসন সংখ্যা হ্রাস পাবে। উপরাষ্ট্রপতির মতে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন দিয়ে এই সংরক্ষণের দাবি করেননি, করেছেন ভোটের জন্য।

Scanned with CamScanner